বঞ্চনাবোধ থেকে গণ-অভ্যুত্থান: তারুণ্যের চোখে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ

ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী

সময়টা ছিল ২০১৮ সালের মাঝামাঝি। তৎকালীন কর্তৃত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক পর্যায়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে সব ধরনের কোটা বাতিল করে দেন। অথচ সব ধরনের কোটা বাতিলের এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছিল আসাংবিধানিক, যার প্রয়োজনীয় সমালোচনা প্রায় সবক্ষেত্রে ছিল অনুপস্থিত। অন্যান্য দেশের ন্যায়, আমাদের সংবিধানে কোটা প্রথার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা। এই সুযোগকে অ্যাকাডেমিয়াতে ইতিবাচক বৈষম্য (পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন) হিসেবে বিবেচনা ও পাঠ করা হয়। তবে দীর্ঘ সময় ধরে এই ব্যবস্থা আর সাংবিধানিক গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই কোটা ব্যবস্থা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক অস্ত্র এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনার অপব্যবহার। সংবিধানে উল্লিখিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য যৌক্তিক কোটাব্যবস্থা শিক্ষার্থীরা সবসময়ই স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি মূল ধারার মুক্তিযোদ্ধা কোটা কিংবা তাঁদের সন্তানদের কোটা নিয়েও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে কোনো বড়ো ধরনের উচ্চবাচ্য ছিল না বললেই চলে। তবে মূল ক্ষোভটি ছিল এই কোটার বিশাল শতকরা হারের (৩০ শতাংশ) ওপর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পর এই বিশাল শতকরা হার তাঁদের সন্তানদের জন্য, এমনকি সন্তানদের পর তাঁদের নাতি-নাতনিদের জন্যও এই কোটা সুবিধা বহাল রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে, বিপুল পরিমাণ আসন (৫৫ শতাংশ) কোটার চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে। তার উপর যোগ হয়েছে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ধনাঢ্য ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাব। ফলে, চাকরি প্রত্যাশী ও শিক্ষার্থীদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি তীব্র হতে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে, আমার সাবেক এক শিক্ষার্থীর বঞ্চনাবোধের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সেই শিক্ষার্থী একদিন আক্ষেপ করে বলছিলেন: “স্যার, আমি পঞ্চমবারের মতো বিসিএস ভাইভা দিয়ে নিচের দিকের একটি ক্যাডারের জন্য মনোনীত হয়েছি।” সেদিন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম যে, “ক্যাডারের কোনো উঁচু-নিচু ভেদ নেই, সবাই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে জনগণের সেবাদানে নিয়োজিত, সেই অর্থে সব সেবাই গুরুত্বপূর্ণ।” কিন্তু আমার এই তাত্ত্বিক ও সান্ত্বনামূলক কথা তার বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতে পারেনি। সে পুনরায় বলল, “স্যার, যখন দেখি আমার চেয়ে সাত বছরের ছোট পরিচিত কেউ একজন প্রথম বিসিএস পরীক্ষা দিয়েই শীর্ষ ক্যাডার পেয়ে গেছে, যার অ্যাকাডেমিক রেকর্ড কিংবা মেধা কোনোভাবেই আমার চেয়ে এগিয়ে ছিল না। এবং পরে জানতে পারি যে সে মূলত একটি বিশেষ কোটার সুবিধা নিয়ে চাকরিটি পেয়েছে, তখন এই বৈষম্য আমাকে তীব্রভাবে পীড়া দেয়। আজ যদি কোটা যৌক্তিক পর্যায়ে (১০% বা ১৫% এর মধ্যে) সীমাবদ্ধ থাকত, তবে হয়ত আমাকে পঞ্চমবারের মতো ভাইভা দিতে হতো না, এর আগেই চাকরি হয়ে যেত।”

অন্য আরেক সাবেক শিক্ষার্থী এবং সরকারি চাকুরি প্রত্যাশী, একদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, “যখনই সরকারি চাকুরিতে ৫৫% কোটার কথা মনে পড়ে, ঠিক তখন কোনোভাবেই নিজেকে স্বাধীন দেশের নাগরিক মনে হয় না। বরং ১৯৭১ এর আগের নিপীড়ন ও বঞ্চনার যে গল্প শুনি তা মনে পড়ে যায়।”

এই ধরনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যখন সময়ের সাথে সাথে অসংখ্য শিক্ষার্থীর সাধারণ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়, তখন সমাজে এক ধরনের সামষ্টিক ক্ষোভের জন্ম দেয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টেড রবার্ট গার (১৯৭০) তাঁর বহুল আলোচিত ও ব্যবহৃত তত্ত্বে ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ কেন এবং কখন অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। তিনি দেখিয়েছেন, তীব্র 'আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধ' (রিলেটিভ ডিপ্রাইভেশন) থেকে মানুষ চরম বিদ্রোহ বা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে পারে। টেড গারের 'আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধের' তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট এই আন্দোলন খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণে করে। বৃহত্তর প্রেক্ষিতে, ঠিক যেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারবঞ্চিত পাহাড়ি জনগোষ্ঠী, ফিলিস্তিনের হামাস কিংবা আমাদের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ অঞ্চলের বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়ার পেছনেও মূল চালিকাশক্তি ছিল এই তীব্র বঞ্চনাবোধ।

ফলে, ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে উচ্চ আদালতের কোটাবহাল-সংক্রান্ত একটি রায়কে কেন্দ্র করে পুনরায় শুরু হয় কোটা সংস্কার (প্রকারান্তরে কোটা বিরোধী) আন্দোলন। শুরুতে এই আন্দোলন ছিল যথেষ্ট নিয়মতান্ত্রিক, সুসংগঠিত, এবং কেবল শিক্ষার্থীদের। বরাবরের ন্যায় এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এর চারপাশ থেকে আগত সাধারণ তরুণ শিক্ষার্থীরাই ছিল এই আন্দোলণের প্রাণ। এই তরুণরাই হয়ে ওঠে সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তথা গণ-অভ্যুত্থানের মূল চালিকাশক্তি। আন্দোলনে প্রধানত অংশ নিয়েছিলেন চাকরি প্রত্যাশী বেকার যুবক-যুবতী। তাদের সাথে

যোগ দেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা, যারা খুব শীঘ্রই পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

চাকুরি প্রত্যাশীদের দীর্ঘ দিনের বঞ্চনাবোধ ২০২৪ সালের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে তৎকালীন সরকার প্রধানের উপহাসের সুর মূলত নিশ্চিত করেছিল আন্দোলনের রূপান্তর, যা একটি স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছিল। তাচ্ছিল্য ও উপহাসের সুর তখন তাঁদের বঞ্চনাবোধের সাথে যুক্ত করে গভীর আত্মসম্মান হানি ও সামাজিক গ্লানি। এর প্রতিবাদে ২০২৪ এর ১৪ই জুলাই মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হলের ছাত্রীরা হলের ফটক ভেঙে বেরিয়ে আসেন এবং রাজু ভাস্কর্যের সামনে এসে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী সমবেত হয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। শেখ হাসিনার দীর্ঘ দেড় দশকের ব্যক্তিতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে এই প্রথম অরাজনৈতিক ময়দান থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁরই দেওয়া 'রাজাকার' সম্বোধনটিকে একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রতি-আক্রমণ হিসেবে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়।

এই অসম্মানজনক আচরণের প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনের তীব্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। পরদিন, অর্থাৎ ১৫ই জুলাই ছাত্র-ছাত্রীরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলের ওপর চলে নির্বিচার লাঠিচার্জ, অকথ্য গালিগালাজ ও অপমান। এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিগুণ শক্তিতে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মানসিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়। এক্ষেত্রে অন্তত দুইটি স্মৃতিচারণ প্রাসঙ্গিক। ১৬ই জুলাই সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ আবুল খায়ের আবাসিক ভবনের পেছনের পকেট গেইট দিয়ে যাওয়ার সময় ফজলুল হক মুসলিম হলের অসংখ্য শিক্ষার্থীকে অস্থির অবস্থায় ইট ভাঙতে ও লাঠি-ইট ব্যাগে নিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়। চরম লাঞ্ছনা, বিশেষ করে সহপাঠী নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে তাদের মধ্যে এক বিশেষ মাত্রার ভাতৃত্ববোধ ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। সহিংসতায় না গিয়ে প্রতীকী শক্তির স্থান তৈরি করতে তাদের ইট-লাঠির বদলে (কিংবা সাথে) বই, খাতা ও কলম হাতে নিয়ে প্রতিবাদে নামার পরামর্শ দিয়েলাম সেদিন। ভেবেছিলাম হয়ত তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরণের অহিংস চেতনা তৈরি করবে।

১৬ই জুলাই রংপুরে আবু সাঈদ নিহত হওয়ার পর, ১৭ই জুলাই ‘বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক’-এর উদ্যোগে অপরাজয় বাংলায় এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ঢাকা মেডিকেলের সামনে পুলিশের ব্যারিকেড থাকায় গাড়ি পার্ক করে আইডি কার্ড দেখিয়ে বিকল্প উপায়ে ফার্মাসি বিভাগের শিক্ষক জুবায়ের আল মাহমুদ ও দর্শনের শিক্ষক কাজী এএসএম নুরুল হুদাসহ আমরা অপরাজেয় বাংলায় পৌঁছি। নগণ্য উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছিল সেসময়। শাহবাগে পুলিশ ও রাজনৈতিক কর্মীদের বাধার কারণে আটকে থাকা মাইক আনতে গিয়ে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষিকা তাসনিম সিরাজ মাহবুবের গাড়িতে করে শাহবাগে যাই। সেখানে এক নারী শিক্ষার্থীকে দুই নারী পুলিশ সদস্য কর্তৃক অপ্রীতিকর টানাহ্যাঁচড়ার সময় হস্তক্ষেপ করে আমরা তাকে উদ্ধা্র করি (যে ঘটনার ভিডিও পরবর্তীতে বেশ আলোচিত হয়)। মাইক নিয়ে ক্যাম্পাসে ফিরে ২০-২৫ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে আবু সাঈদ হত্যা ও নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে একটি মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নুরুল হুদা আমাকে আগেই জানিয়েছিলেন তার এক শিক্ষার্থীকে শাহবাগ থানায় আটকে রেখেছে, যা পরবর্তীতে আমি সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা সামিনা লুৎফাকে জানাই। সেই সূত্র ধরে, মিছিল শেষে শিক্ষকদের সম্মিলিত নেতৃত্ব ও আলোচনার মাধ্যমে থানা থেকে আটককৃত দুইজন শিক্ষার্থীকে আলোচনার মাধ্যমে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়। এই খবর পুরো আন্দোলনকে নতুন একটি মাইলফলক দিইয়েছিল বলেই মনে হয়।

অর্থাৎ জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেবল তাৎক্ষণিক কোনো ক্ষোভের ফসল ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কলুষিত ও নিপীড়নমূলক আবাসন ব্যবস্থা, চরম অমানবিক তকমা এবং রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভই এতে বিস্ফোরিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ছাড়া দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছিল। সাথে যোগ হয় শেখ হাসিনার শাসনামলের তিনটি প্রশ্নবিদ্ধ ও অগণতান্ত্রিক নির্বাচনের কারণে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা ও বঞ্চিত রাজনৈতিক বিরোধী শিবিরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। ফলশ্রুতিতে, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পতন ঘটে এবং রাষ্ট্র পুনরায় গণতন্ত্রের পথে হাঁটার এক ঐতিহাসিক সুযোগ লাভ করে।

কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, তরুণদের আত্মত্যাগ বারবার এক ধরনের চক্রাকার হতাশার জন্ম দিয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন তরুণ সমাজ এক পর্যায়ে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিল। তরুণদের ১৯৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন তথা নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্রের যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাও পরবর্তীতে ২০০৬ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

চব্বিশের আন্দোলনেও তরুণ শিক্ষার্থীরা রক্ত দিয়ে, জীবন উৎসর্গ করে একটি স্বনির্ভর, সার্বভৌম ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনেছিল। স্বপ্ন ছিল কীভাবে এই দেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। কিন্তু প্রতিবারই এই স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের প্রচলিত নোংরা অপরাজনীতির সংস্কৃতি। আজও শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের চোখে মুখে একদিকে যেমন হতাশার ছায়া দেখি, ঠিক তেমনি এর বিপরীতে এই প্রত্যয় লক্ষ্য করি যে, ভবিষ্যতে যে সরকারই অগণতান্ত্রিক পথে হাঁটবে, তার পরিণতি এমনই হবে। তারা আবারও রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে না।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে, তারা বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার এবং রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বৈষম্য দূর করে যুবসমাজের আস্থা অর্জন করতে হবে। আর এভাবেই গণতান্ত্রিক চর্চা সুদৃঢ় হবে এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতি রাষ্ট্রের যে অপরিশোধ্য ঋণ রয়েছে, তা কিছুটা হলেও শোধ হবে। প্রকারান্তরে বাংলাদেশ একটি সত্যিকার অর্থে স্বনির্ভর জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

আমাদের বুঝতে হবে, চব্বিশের আন্দোলনে তরুণ প্রজন্মের মূল দাবি ও স্বপ্ন ছিল একটি বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই আন্দোলনের সূত্রপাত ছিল কর্মসংস্থানকে কেন্দ্র করে। তাই বর্তমান সরকারকে এই মনস্তত্ত্বটি গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষা ব্যবস্থায় সময়োপযোগী আমূল পরিবর্তন এবং স্বল্পমেয়াদে যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত ও বৈষম্যহীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই হবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

#

লেখক: অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিআইডি ফিচার